## KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 2007 | Place of Publication : 28/2 আর. এন. চৌধুরী লেন, কল-৩৬ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায় |
| Title : অনুভব (ANUBHAB) | Size : 8.5"/5.5" |
| Vol & Number : গ্রীষ্ম সংকলন<br>শারদ সংকলন Puja Special<br>শারদ সংকলন (Autumn)<br>শারদ সংকলন (Autumn) | Year of Publication : May 1981<br>1981<br>1984<br>1987 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায় | Remarks |

C.D. Roll No : KLMLGK

বাংলা সাময়িকপত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

# অন্বিষ্ট

কবিতা পত্র

গ্রীষ্ম সংকলন ১৩৮৮

৩·০০

অনুভব কবিতা পত্র
গ্রীষ্ম সংকলন
মে ১৯৮১

লিখেছেন :

অমিতাভ চৌধুরী কৃষ্ণ ধর মৃণাল বসুচৌধুরী শচীন মোদক আশিস সান্যাল নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিজয়কুমার দত্ত মনোজ নন্দী মতি মুখোপাধ্যায় সুমর জোয়ারদার প্রশান্ত রায় কাজল চক্রবর্তী শেখর চক্রবর্তী তাপস বসু শান্ত রায় দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধার্থ সিংহ পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় অভিজিৎ ঘোষ উত্থানপদ বিজলী সমর ঘোষ রঞ্জন সরকার জহর সেন মজুমদার

আনন্দ বাগচী কেদার ভাদুড়ী জয়ৎ সেন সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় তেজেশ অধিকারী রাজা মজুমদার প্রবালকুমার বসু শান্তনু লাহিড়ী অমিতাভ দাশগুপ্ত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত অজিত মৈত্র আনন্দ ঘোষহাজরা শান্তনু দাস পঙ্কজকুমার মণ্ডল সলিল লাহিড়ী সজল বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ নামাঙ্কন ॥ অরুণ মুখোপাধ্যায়
মুদ্রণ ॥ অধুনা
দপ্তর ॥ ২৪/২, আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১

## অমিতাভ চৌধুরী

### ছড়া

১.

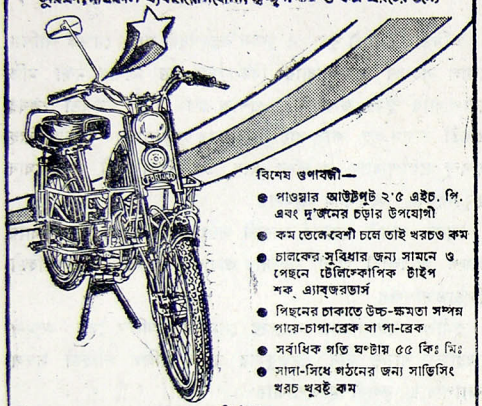

কোন্ ভাষাতে ভূতের আলাপ
কেমন তাদের ইডিয়াম,
সেই কথাটি বলতে নারাজ
প্ল্যানচেট বা মিডিয়াম।
ভূতের ভাষা বুঝতে
তাইতো গেলাম খুঁজতে—
লাইব্রেরিয়াম থেকে আনি
এনসাইক্লোপিডিয়াম !

২.

ব্যাপারটা কী ব্যাপারটা কী—
কী কথা তুই কস্‌লো
কাছারি নয় কারখানা নয়
এরোপ্লেনেও গোস্লো !
যাবার কথা নিউইয়র্ক
এলাম মাত্র অস্‌লো !

## আমার কবিতা

কবিতার নিচে সন তারিখ লেখার অভ্যেস নেই। এখন তাদের দিকে তাকালে সেই সব সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনেক স্মৃতি মনের দরজায় এসে কড়া নাড়ে।

ওরা বলে, মনে আছে কবে আমাকে শব্দের খাঁচায় পুরেছিলে? সেই দূর সময়ে আমরা একদিন তোমার কবিতা হয়ে উঠেছিলাম।

এই সব অনুভূতি উপলব্ধি একদিন একান্ত নিজস্ব ছিল। আজ তারা শব্দ উপমা, চিত্রকল্পে বন্দী। ছাপাখানার কম্পোজিটার এদের একদিন অক্ষরে বেঁধে দিয়েছেন। এরা কবিতার সংসারে প্রবেশ করেছে সেই দাবিতে।

কোনো কোনো কবিতায় এক একটি যুগ ধরা আছে হয়তো বা। আমার সময় এবং বয়স। তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবেনা কোনো মতেই কিন্তু ওরা আছে সত্য হয়ে। আমার কাছে কবিতা লেখার এই দাম।

একটি কবিতা 'সারনাথে সন্ধ্যা' পড়তে গিয়ে বেনারস থেকে সারনাথ যাবার সেই দুপুরের কথা মনে পড়ল। টাঙ্গার শব্দ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। এই পথ এই দুপুরের রোদ আর কি কখনও ফিরে আসবে? অথবা মূলগন্ধকুঠি বিহারের সামনে সেই আলাপচারিতা?

ভালবাসা দিয়েই কবিতা লেখা হয়। কবিতাটি ফের পড়তে গিয়ে টের পাই: বেঁচে থাকা কী সুন্দর!

অন্য কেউ সাক্ষী ছিল না যখন কন্যাকুমারিকায় সেই রাত্রিতে সমুদ্র উপকূলে নারীর কান্না শুনেছিলাম। সাগরে যে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেই শক্ত সবল জোয়ান মানুষটা আর ফিরে আসেনি। সেই কান্না থেকে কবিতাটির জন্ম। পঁচিশ বছর আগে কবিতাটির জন্ম, 'কন্যাকুমারিকায় একরাত্রি।'

ওরা বলেছিল, তুমি আমাদের ভাষা দাও। আমরা তো শুধু কাঁদতে জানি, তুমি তাকে শব্দে বাঁধো। জোনাকিরা উড়ছিল। আমার আর ঘুম এল না সেই রাত্রিতে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তটে। বড় নির্মম আর নিষ্করুণ।



এইভাবে আমার মনে পড়ে যায় সেই শিশুটির কথা যে একদিন খেলার পুতুল ফেলে হঠাৎ চলে গিয়েছিল। মৃত্যুকে সেদিন নিজের কোলে রেখে তার মুখ দেখলাম। কি ভাষা দেব তাকে? আমি কি সেই সব শব্দ জানি যা দিয়ে মৃত্যুর শীতলতায় দেওয়া যায় উত্তাপ? বহুদিন আমাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল।

ওরা মিনতি করে বললে, তুমি না কবি। তোমার হৃদয় এত কঠিন পাথর কেন? তুমি কি শুধু নিজেকে ভালবাস? আমরাও তো এতদিন তোমাদের এই পৃথিবীতে ছিলাম। আমাদেরও ভালবাসা ছিল এই আলো এই নক্ষত্র, এই উদ্যানের জন্য।

আমি কলম নিয়ে বসি।

কথারা আমাকে ছলনা করে চলে যায়। আমি তাদের মিনতি করি। তারা চুপ করে থাকে। নিজের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে আমার কলম ক্ষতবিক্ষত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। শব্দের শরীরে এত লাবণ্য অথচ আমি তাকে ধরতেই পারি না। মনে হয়েছিল যেন আমি পাগল হয়ে যাব।

ওদের দয়া হয়তো। আমি সব ছেড়েছুড়ে কলকাতার বাইরে চলে যেতে চাইলাম। আমি এই অক্ষমতা থেকে মুক্তি পেতে চাইলাম পরিবেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে। সেই রাত্রিতে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওরা এসে বলল, এসো আমরা তো দুয়ারে অপেক্ষা করছি। দরজা খোলো। কতক্ষণ আমরা হিম মাথায় বসে থাকব?

সেই মায়াবী দরজা খুলে দেখি জ্যোৎস্নায় চাতাল ভেসে যাচ্ছে। আমি তাদের ডেকে এনে বসাই। ওরা সাদা পাতায় কালো অক্ষরের পোষাক নিয়ে আমার চোখের সামনে দাঁড়ায়। তখন আমি তাদের চিনতে পারি। আমি কবিতায় রূপ দিই হৃদয়ের বেদনা।

এইভাবে তারা এসেছিল। এখনও আসে। কখনও আনন্দে, কখনও বিষাদে। আমার শুধু দুঃখদিনের ছবিই মনে আছে। তারাই স্থায়ী।

সুখের দিনে আমার কবিতা পালায়। সুখে আমি বিপন্ন বোধ করি। আমার কেবলই পৃথিবীর সব দুঃখী মানুষদের কথা মনে পড়ে।

ভালোবাসার মুহূর্তেও আমি নারীর চোখে করুণতা দেখি। যাদের দেখিনি তাদের দুঃখও আমারই দুঃখ।

আমার আর নিজস্ব কোনো দুঃখ নেই।

আমার দুঃখ আমার কবিতা। আমার কবিতা এইভাবে কখনো কখনো লেখা হয়ে যায়।

## মৃণাল বসুচৌধুরী

### কবিতা ও আমি

নিজের কবিতা সম্পর্কে লেখা খুব শক্ত। কেননা, এমন কিছুই লিখিনি এ যাবৎ, যা নিয়ে কিছু বলা যায়। কেন লিখি কিভাবে লিখি, এসব ঠিক মতো গুছিয়ে বলতে পারিনা। নিজের দিকে তাকানো উচিত হয়ত, কিন্তু তেমনভাবে নিজেকে শাসন করা, শাস্ত্রসম্মত করে তোলা কি কোন কবির পক্ষে সম্ভব ? হতে পারে, কিন্তু আমার তেমন কোন ক্ষমতা নেই। আমার কবিতার পাঠক যদি কেউ থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন আমার গতিপথ। বলার দরকার কি ? তবে সুযোগ যখন পাওয়া গিয়েছে, আমার ফেলে আসা পথের একটা ছবি আমি আঁকার চেষ্টা করতে পারি—ভবিষ্যতেও কখনো যদি দু একজন পাঠক পাওয়া যায়—তাঁদের কথা ভেবে।

আমার প্রথম কবিতার বই 'মগ্ন বেলাভূমি'। ১৯৬৫ সালে শ্রী শান্তি লাহিড়ী ও শ্রী স্বদেশরঞ্জন দত্তের উৎসাহে ও আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর 'শহর কলকাতা' প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ 'যেখানে প্রবাদ' এবং ১৯৭৬-এ 'গুহাচিত্র'। 'ভুল' নামে একটা উপন্যাস বেরিয়েছে সম্প্রতি। এ ছাড়া কবিতার দিক থেকে সমমনোভাবাপন্ন কবিদের সঙ্গে সংকলন গ্রন্থ '১৯৭৭' এবং '১৯৭৯'। 'মগ্ন বেলাভূমি'র কবিতা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। তবে প্রথম এবং চতুর্থ বইএর মাঝখানের পথটুকু, যা পেরোতে আমার ১১ বছর সময় লেগেছে, ছিল রক্তাক্ত। নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ, কখনো কখনো (স্বীকার করতে লজ্জা নেই) বোধের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই আমাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল সবসময়। একান্ত নিজস্ব কয়েক ইঞ্চি জমির জন্য জনপ্রিয়তাকে বাজি ধরতে হয়েছিল।

যখন প্রথম লিখতে শুরু করি সেই সময়টার কথা ভাবুন। প্রচণ্ড প্রভাবশালী প্রতিভাবান পঞ্চাশের কবিরা তখন আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। পাদ-প্রদীপের আলোর সামনে তাঁদের উজ্জ্বল মূর্তি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সকলের। কফি হাউসের টেবিলে, পত্র-পত্রিকায় ওঁদের রাজকীয় উপস্থিতি। আমি তখন গ্রাম থেকে সবে এসেছি কলকাতায়। ভয়ে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ওঁদের দেখতাম দূর থেকে, বাড়ি ফিরে রাত জেগে কবিতা পড়তাম ওঁদের। সুনীল-শক্তি



শরৎ-সমরেন্দ্র উৎপল অমিতাভ...এঁদের কবিতা আচ্ছন্ন করে রাখতো আমায়, অবিরাম খেলা করত রক্তের মধ্যে। নিজে কিছু লিখতে গেলেই এঁরা কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যেতেন সামনে। ওঁদের পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার এগিয়ে আসতেন। এ ভাবেই কিছুদিন যায়। তারপর একদিন হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধমকাই। নিজের মতো করে, স্বতন্ত্রভাবে লেখার কথা ভাবতে থাকি।

'শ্রুতি' বেরোয়। পুষ্কর দাশগুপ্তের সাহচর্যে এসে কবিতা সম্পর্কে ভাবনা বদলে যায়। সজলদা, পরেশ, তপন সবাই মিলে নতুনভাবে লেখার উৎসাহ বোধ করি। শেষ দিকে 'শ্রুতি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন অশোক চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক এবং আরো দু'একজন।

নতুনভাবে কেন, আদৌ কিছু লিখতে পেরেছি কিনা জানিনা, তবে পঞ্চাশের কবিদের প্রচলিত কাব্যধারার কাছে আত্মসমর্পণ করিনি পুরোপুরি ভাবে, এটা বোধহয় বলতে পারি।

'শ্রুতি'তে প্রকাশিত বিভিন্ন ইস্তাহারের সঙ্গে আমার বা আমাদের কবিতার মিল আজ কতটুকু এ প্রশ্ন আসতে পারে—কিন্তু তবু 'শ্রুতি' ষাটের দশকে বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'শ্রুতি' আমাকে একটা নতুন জামা দিয়েছিল। পরে ইচ্ছেমতো প্রয়োজন মতো আমি তার কাটছাঁট একটু বদলিয়ে নিয়েছি।

আমার কাছে কবিতা এক ধরণের মুক্তি। ব্যাকরণের বেড়াজাল, সংস্কারের বন্ধন, প্রচলিত বাক্‌ভঙ্গীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। পরিচিত অনুষঙ্গ থেকে শব্দকে আমূল তুলে আনতে চাই—চেষ্টা করছি ভিন্ন অনুষঙ্গ তৈরী করার। পরিমিত শব্দ ব্যবহারে, চিত্রকল্পে তথাকথিত ভাবালুতা বর্জনে আমি বিশ্বাসী। আর তাই, আমার কবিতার পরপর দুটো লাইন ব্যক্তিগত বিরোধী পারম্পর্য-হীন মনে হয়, হতে পারে। পাশাপাশি দুটো শব্দের মধ্যে কিম্বা দুটো লাইনের মধ্যে হয়ত এক ধরণের ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি জানি, শিক্ষিত পাঠক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরিয়ে নেন সেই ফাঁকটুকু। কবিতা অবশ্যই অভিজ্ঞতা-নির্ভর, তবে সে অভিজ্ঞতা কবির অন্তরলোকের অভিজ্ঞতা, এবং যা রহস্যময়। কবিতায় অতিকথন, আরোপিত বিষয়, মেকী সমাজচেতনা আমার পছন্দ নয়। সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের ব্যবহার নিয়ে একসময় ভাবতাম

খুব। শুধুমাত্র কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে একটা কবিতাও লিখেছিলাম—মনে আছে। এখন এসব নিয়ে আর তেমন ভাবিনা।

কবিতার শরীরকে নতুনভাবে সাজাতে চাই। বেশীরভাগ লেখাতেই চোরাপথে পয়ার ঢুকে পড়ে। ভেঙে চুরে, বিভিন্ন মাত্রায়, ( বেশীর ভাগ সময়েই দশ ) ব্যবহার করতে ভালোবাসি।

এতক্ষণ যা লিখলাম, বুঝতে পারছি, স্পষ্ট করে কিছুই বলা হ'ল না। আসলে কবিতাকে ঠিক কেমন ভাবে চাই সেটা কি নিজেই জানি? প্রায়শই তাই প্রশ্ন জাগে—কবিতা কি কোন রহস্যময় দরোজার চাবি? নাকি স্বপ্নের মধ্যে ঘোড়দৌড়—কবিতা কি সেতুর ওপরে শূন্য বাতিঘর না কোন নিরন্তর যুদ্ধ? এ সমস্ত প্রশ্ন উত্তরবিহীন থেকে যায়—শুধু জানি, কবিতা, খেলার অভ্যাসে কোন খেলা নয়।

সবশেষে জানিয়ে রাখি, 'গুহাচিত্রে'র পর, এখন আবার, নিজের তৈরী দুর্গ থেকে বেরোতে চাই। মায়ামমতা মাখানো এই স্মৃতিময় দুর্গ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে ভয় হয়—। যেতে হবে জানি, কিন্তু পারছি না, উদ্যম বা সাহসের অভাব?

ভাবছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার একদিন থাপ্পড় মারবো নিজেকে।



## শচীন মোদক

কবিতা

আলোর শেষ কণাটুকু মিলাল শেষে
দিগন্তের প্রান্তে এসে
ছায়াচ্ছন্ন হোল চরাচর ;
প্রশান্ত গম্ভীর অম্বর
পাখীদের পাখার উচ্ছ্বাসে,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
মর্মরিত অরণ্যের প্রাণে
অশ্রান্ত সমুদ্র গর্জনে—

তুমি কি শুনেছ সে গান?
সে মহা-কলতান?
যদি শুনে থাক—
তবে জেনে রাখ
তোমার জীবন দেবতা
দিয়েছেন তোমারে কবিতা॥

বিনা বিজ্ঞাপনে যে বইটি বেরুলো

প্রশান্ত রায়ের
এই চোখে ২·০০

অন্যান্য বই ফিরে দেখুন ( প্র. সং. প্রায় নিঃশেষিত )
রং নাম্বার

## আশিস সান্যাল

### নতুন বছর

আরেকটি বছর গেলো শব্দহীন খসে।
হৃদয়ের নির্জন প্রদেশে
উঠলো বিপুল ঝড় তীব্র বেদনার।
চেয়ে আছি শূন্য পথে—
দেখি অন্ধকার
গোপন গলির পথে ভাঙা ঘর বাড়ি।
অনেক ক্ষতের চিহ্ন,
চারদিকে ব্যর্থতার ধূ-ধূ বালিয়াড়ি।

চলে যাবো? যেতে হবে জানতাম, তবু
ভাবিনি কখনো
ত্বরান্বিত হবে এই শেষতম দিন!
সর্বত্র ধ্বনিত ওই
মৃত্যুর অমোঘ ধ্বনি অবিরাম বাজে অন্তহীন।

শূন্য পথে চেয়ে আছি। দূরে—
কে তুমি দাঁড়ালে একা
সারা পথ জুড়ে?
কখনো দেখিনি আমি
এ ভীষণ ভয়ঙ্করী তৃষিত স্বরূপ।
কে তুমি? কে তুমি, বলো?
মৃত্যুর মহিমা তুমি?
তুমিই কি পুড়ে যাওয়া জীবনের অন্তর্গত ধূপ?

সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত শহরে
কেবল মৃতের হাড়,



ভাঙা বাড়ি—
আর সব কল্পনার পচা গন্ধ স্তূপ।
আমার গোলাপ বনে
ফুল নেই—
পড়ে আছে শব্দহীন অস্পষ্ট অরূপ।

আরেকটি বছর গেলো নিরুপায় খসে।
অন্ধকারে বসে
দেখছি অনেক দূরে প্রান্তরের ঘাসে
সাতটি অচেনা পাখি
আমাকেই নাম ধরে বার বার ডাকে।
পেছনে ধূসর পথ,
তপ্ত বালিয়াড়ি—
অনেক ক্ষতের চিহ্ন,
ব্যর্থতা ও ঘৃণা;
অথচ কোথাও আমি
তোমার নন্দিত ছবি দু'চোখে দেখছি না।

সকলেই চলে যাবে। যেতে হয়—
দিন চলে যায়, মাস চলে যায়,
ক্রমে চলে যায় পুরানো বছর—
তবু পরস্পর
ভালোবাসা বেঁচে থাকে অনন্তের ডালে।
জীবন পথের শেষে
দু'পা বাড়ালে
দেখা যায় তার সেই স্নেহময়ী রূপ।
চারদিকে জ্বলে আর
ছেড়ে আসা ঘর-বাড়ি, প্রিয় দিন—
সীমাহীন অন্ধকারে ভস্মীভূত জীবনের ধূপ।

## নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

### গন্তব্য

আলো-ছায়ার মধ্যে ঘর বাঁধা। এখানে
ঘাস, ওখানে ডোবা, ওখানে অবিশ্বাস, এখানে
সাপের গর্ত ইত্যাদি। সংস্কৃতি হতে হাওয়া
গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলে: 'যাই কোথায়!'

পাটে বসবার আগে সাত্র বলেছিলেন: 'কোন এক
গূঢ় কন্দরে আমরা আত্ম-আবিষ্কার করবো না।'

তাহলে তো থাকছে গাছের মতো ঘিরে থাকা
লোকজন। মাথায় তাদের সংসারের ভার,
বুকের উপর প্রবঞ্চনার বাসি দাসত্ব।

—এদের নৌকা ডুবে যাবে প্রথম জলোচ্ছ্বাসে।

তবু এদের মধ্যেই চলমান উপ-মানব আমি;
হয়তো ব্যর্থতা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো
আমার আকাশ জুড়ে। হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস
দীর্ঘ চুলের মতো লম্বিত।

—কিন্তু কতদূর! —নিশ্চয়ই জীবনের সীমারেখায়
যেখানে ভবিষ্যৎ এসে মিশেছে
বর্তমানের সঙ্গে, তার চেয়ে দূরে নয়।

সেখানে তো কালের পাখির কাকলি
শুধু ব্যর্থতার কথা বলবে না।



## বিজয় কুমার দত্ত

### খেলা

অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি কোষের
ভিতরে বাইরে আজ রক্ত চলাচল
অথচ একদিন তারা জ্যৈষ্ঠের মাটির মত ছিল রুক্ষময়
অনুর্বর জলভারাতুর—
কখন শ্রাবণ এল আষাঢ়ের ঘনমেঘ হঠাৎ পেরিয়ে
কখন ক্ষুধার্ত কোষে রসের সঞ্চার
ঘটে গেল—কে যে তার নেপথ্য চালক
সেই কথা দৃষ্টি ও শ্রবণে
লেখা রইল প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে, প্রতিটি শব্দের
অক্ষরের বাঁধভাঙা মরণ উচ্ছ্বাসে
অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতরে ভিতরে আজ কার
ধারালো প্রতিভা শুধু খেলা করে যায়
কে তার ঠিকানা বলবে একান্তে আমায়?

## মনোজ নন্দী

### বিপদ সংকেত

মানুষের ঘর-বাড়ি প্রাত্যহিক রুটির হিসাব
অসম্ভব দ্রুত কাঁপছে। আর মোচড়ানো ঘাড়ের নিচে
আজ্ঞাবহ মানুষের কাঁধ সমাপ্তিবিহীন কোনো শোষণের
জাল ক্রীতদাসের মতোন ঠিক বহন করেছে;
শোক-মিছিলের দিকে শব্দহীন তীক্ষ্ণ তর্জনী তুলেছে কিছু
ভ্রষ্ট মানুষেরা।
অর্থহীন পিছল জ্যোৎস্নায় অতর্কিতে
ক্ষুধার নাপাম বিপদজনক হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছে
আজ সমস্ত ট্র্যাফিক।

## মতি মুখোপাধ্যায়

### চরণ-ধ্বনি

নীল শালবনে নেমেছে রক্তের পাহাড়ী :
ঢলে হলে কথা ছিল, সে শুধু খোয়াই
অথবা খোয়ারি
ভেঙে যাচ্ছি উদয়াস্ত
চারপাশে জনবন, কঠিন শালের
হাত পা মাথা বুক পেট, একেকটা মানুষ
যাদের চোখ ছিঁড়ে উড়ে আসছে হাওয়া
শুখা দিন
ধুলো ওড়ে, এঁটো শালপাতা, তাও
উড়ে আসে মানুষের হাড়
শাদা হাড়ে ভরে গেছে পাহাড়-জঙ্গল
অতি দ্রুত পড়ে ফেলি এইসব
তারপর বাসি কাগজ সরিয়ে রেখে ভাবি
একদিন
অই নীল শালবন, সব গাছ, গাছের হৃদয়
সব যাবে
তখনো খোয়াই ভাঙা আমাদের
রাতদিন রক্তের খোয়ারি।

তবু কোন ভোরে কণিকা যখন গেয়ে ওঠেন :
প্রথম আলোর চরণ ধ্বনি...
মনে হয় অই গাছ, একেকটা মানুষ যে যার
জতুগৃহ থেকে উঠে আসবে
মুক্তির দেবদূত হয়ে।



## সুমর জোয়ারদার

### প্রতিদিন

আমার চারপাশের অভাবের ছবিগুলো
ভেঙেচুরে সাজিয়ে তুলতে চাই—
রঙের ভুলগুলো এমন বেইমানি করে—
সপুষ্ট শরীর খুঁজি কল্পনান্ত বিবশ প্রহরে
তবুও সেই এক ছবি ফিরে ফিরে আসে
আলো অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরের দেয়ালে
অভুক্ত বিবর্ণ সত্যাগ্রহে কালাতিপাত করা
দীর্ণ শরীর
ঘর-গেরস্থালি ভেঙেচুরে একসার হয়ে আছে
কালের দাপটে।

এক একদিন ভাবি
কেমন সকলে ছবি এঁকে এমনি পুরস্কৃত হয়
ছায়াময় ভালোবাসাগুলো
আমিও সবার মতো আনন্দ ফোটাবো এখন
আশাভঙ্গ ছেড়ে যেন বিভোর বিভাসে
কি যেন করি
হৃতশ্রী জীবন যেন আমার তুলিতে বারবার আসে
আঁকতে পারি না কেন মহাদৈর্ঘের দিন
ক্যানভাসে স্পষ্ট হয়ে আছে
মাটির দেয়ালের চারপাশে আবর্জনার মতো বিড়ম্বনার ক্ষত
আমি ভেঙেচুরে সাজিয়ে তুলতে চাই—
বিবর্ণ ছবিগুলোকে নূতন করে আনন্দ উল্লাসে।

## প্রশান্ত রায়

### মাটির ঘোড়া

কি করে ভাঙলি তুই এ পরণ ঘোড়া
সুভাষ, রাঙা মাটিতো নয় এ রূপকথার
শুকসারী অহরহ খাড়া। ভালবাসা,
বুঝলি না ; বুঝলি না—আহা মাটি দিয়ে মোড়া !

শীতল পাটি সুভাষ, রাঙা মাটি
ভালবাসার মতোই খাঁটি। কি করে ভাঙলি
টুকরো টুকরো হাসি-হাসি মতো
সুভাষ, মাটি দিয়েই মাটি জোড়ে পরিপাটি

এ-কথা কি জানা তাই খান-খান খান-খান ভেঙে খেলা
বাতাস ওড়াক মন-মেঘলা সমস্ত বেলা।

## কাজল চক্রবর্তী

### শৈশব যৌবনের কবিতা

শৈশব তুমি শুধু কানামাছি খেলা
তুমি বিভূতিভূষণ
তোমার স্বপ্নের ঘাম মুছে ফেলি ভোরবেলায়।

তোমাকে দেখেই, দেখা হলো
দেখলাম—বুঝলাম
মৃতের জন্য কিছু নয়
স্মৃতি নয় ব্যথা নয়
পৃথিবী ! না সে-ও নয়।
সবই জীবিতের ॥



## শেখর চক্রবর্তী

### ওরা নেমেছে মাঠে এই শব্দে ক্ষণকাল

ওদের ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে খেলা ওদের ঘরকন্নার প্রেম
এক কপালের ঘাম মানে এক সাহসে ডুব
এটাই ওদের ভুল ?
কিংবা গাছের অলস ডালে লক্ষ ঘরের ফুল
ছিঁড়তে ছিঁড়তে খেলতে খেলতে বুকের ভেতর ক্রোধ ;
মানে রক্ত ঝুটি লাল।
বুকের খাঁচার কলজেটাতো ভাদ্রমাসের তাল
এটাই ওদের ভুল।

এই লোকালয় এই কিছু নয় দুহাত ভেঙ্গে দেখি
এই মেঝে মাঠ বুকটা কেটে রক্তে কেমন লাগে
বাউল গানের আসর বেঁধে মুখটা এমন তেতো
ঘরকন্নার খড়ের চালে আর দেবো না পাতা
মানুষ বলে কথা
সত্য কঠিন ঝড় ঝঞ্ঝাট কাঙাল নদীর জল
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে খেলতে খেলতে এক গা ঢালা রোদে
উল্টেপাল্টে দেখে এতে মানুষ কোথায় আছে
এতে কুকুর কোথায় আছে
এতে ভুলের কড়ি কত

এটাই খেলা। ভুল কি ভীষণ ভুল
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে খেলছে ওরা ঘরকন্নার প্রেম
কানে গোঁজা রক্ত জবার ফুল ॥

## তাপস বসু

### ব্যবধান

রোববার বাদে
সপ্তাহের বাকী ছটা দিনে দেখি ফ্রক পরা মেয়েটাকে
ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে
ট্রাম এসেছে কোনদিন ; কোনদিন আসেনি
একই সঙ্গে উঠেছি
হাঁ করে দেখেছি
এবং পরে জেনেছি তার নাম নাকি শাহিন

তারপর ট্রাম চলে গেছে অনেক
কিছু কিছু গাড়ি মুখ হাঁড়ি করে ভিতরে ঢুকেছে
সব মানুষেরা ফিরে গেছে তার নারীর কাছে
শাহিনকে দেখিনি আর
ভুলে গেছি কালে কালে

প্রায় দশবছর বাদে
দাঁড়িয়েছিলাম ঐ ট্রাম স্টপেজে
দেখি ফ্রক নয়, শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে সে
একা নয় অন্য একজনের সঙ্গে
ব্যাগ নেই, বিনুনি নেই, কিছু নেই
মুখটা ঝলসে গেছে
কলসির মত বেঁকে গেছে যেন শরীরটা
হাজার বালতি জল দিয়ে ধোয়া হবে দেবমন্দির
তারই সেবাদাসীর মত দাঁড়িয়ে
সবকিছু ছাড়িয়ে ; কুল কুল সকাল
পেয়ারা চুরির দুপুরের মত ট্রাম গাড়ীর ঘণ্টা নাড়িয়ে
শাহিন যেন ভাঙাচোরা শহরটাকে ঝাঁকুনি দিল

বুঝলাম বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সত্যিকাজের অনেক ব্যবধান।



## শান্ত রায়

### আগুনের কাছে

আগুন রয়েছে হালকা অন্ধকারে, গাড়িবারান্দার নিচে
থামের আড়ালে
অন্ধকারে তাকে বড়ো সুন্দর দেখায়
সোনালি বাহুতে, আর রক্তিম, ঈষৎ ফাঁক, দুই ঠোঁটে
নেশা, আবেদন……
পুরুষমানুষ, তুমি অফুরান পথ দিয়ে যেতে-যেতে অদূরে দাঁড়াও।

মেহেদি রঙের শক্ত খোলসের নিচে
বেদানার মতো গূঢ়, ফিকে লাল, তোমার বেদনা?
বলো, সুখের চেয়েও কিছু বেশি তাপ চাও?

উঁহু, তুমি আরো দুঃখ পাবে বা পাবে না
দহন তোমাকে আগে বলবে না কিছু

আগুনের কাছে যাবে? সে ওই তো অন্ধকারে
গাড়িবারান্দার নিচে…

## দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

### তিন জন নেই

তার দীপ্র চোখে কারুকার্যময় দুই হাত
যা গতকাল হৃৎপিণ্ড ছুঁয়েছিলো
আজ সে চিন্তিত নয়। ঠিক আছে বিস্তৃত সংলাপ
বনপথে তিন জন নেই
যতো খুশি বেলা যাক্ পর্যটনে
নীল ভোর ছুঁয়ে জেগে উঠছে সুরভিত দিন
পাখির ডানায় লগ্ন গীর্জার ঘণ্টা-ধ্বনি

## সিদ্ধার্থ সিংহ

### কবি

সুখেও থাকে না কবি, অ-সুখেও নয়
কবি থাকে
ফুলের পরাগ হয়ে থোকা থোকা মাটির ওপর
যে মাটিকে চুমু খেয়ে যায় কয়েক ছটাক সূর্য।
কোলে ধরে রাখে
ফ্রিজ থেকে ছুটে আসা চূড়ান্ত বাতাস,
জন্ম নেয় তুলসী ও গঙ্গা।
সে মাটির চাতালে দাঁড়িয়ে
কবি গরম জলেতে হাঁটু সেঁকে
এবং আকাশ দেখে
দাবাটাও খেলে।
আসলে কবি কোনো পাপেও থাকে না, পুণ্যেও নয়
কবি যে কোথায় থাকে
কবিই জানে না।

## পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

### জীবনের প্রয়োজনে

রাতের আঁধার আছে জানি,
জানি অরণ্যের অন্ধকার—
তবু আমরা সূর্যের কথা ভুলিনা কোনোদিন।
সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেলে
সূর্যের অপেক্ষায় থাকি।
আদিম অন্ধকার শ্বাপদের মতো পথ রোধ করে,
তবু অন্বেষণ আলোকিত জীবনের—
জীবনের প্রয়োজনে জীবন জেগে উঠুক।



## অভিজিৎ ঘোষ

### অভিমান

আমি আজ বাড়ী যাইনি। মধ্যরাত্রি হ'ল
কেউ আমাকে ডাকতে আসেনি
এক ছন্নছাড়া ইটুপিড়ের মতো
আলগোছে শিষ্ দিচ্ছে হিমবাতাস
ছোট বোনের মতো পা ছড়িয়ে
কাঁদছে দু'টো কুকুর
ইদানীং মানুষজনের সঙ্গে দেখা হ'লে কেউ
এক ফালি হাসি দিয়েও সম্বর্ধনা জানায়না
ধূলোবালি গায়ে মেখে তাই বসে আছি
বাড়ি যাইনি, মধ্যরাত্রি হ'লো
আজ কেউ ডাকতে আসেনি
আজ আমি বাড়িতে যাইনি.....

## উত্থানপদ বিজলী

### যেমন আছি

একে কি বাঁচা বলে? ধুকধুক হৃদয় স্পন্দন
একে কি চলা বলে? অবরুদ্ধ পাষাণ প্রাচীর
যেখানে জলের দামে বিক্রি হয় নারীর যৌবন
বিবেক লাঞ্ছিত হয় অপমানে অবনত শির
এক মুঠো অন্ন চাই চতুষ্পার্শ্বে ঘোরে পরিজন।

একে কি শিক্ষা বলে? ব্যবসায়ীর হাতের পুতুল
বিক্রীত হয়ে যাওয়া হ্যাঁ বলালে—হ্যাঁ
একে কি সমাজ বলে? চারপাশে নোংরা আবর্জনা
হৃদয়ে প্রোথিত হয় হাতের ত্রিশূল।

## সমর ঘোষ

### তোমার শরীর জুড়ে

কাছে এসো,
তোমার শরীর জুড়ে চন্দনের ঘ্রাণ।

চতুর্দিকে আবর্জনা
রক্তে পচন-ক্রিয়া ধরালে তারপর
পুরোনো বাড়ির প্লাষ্টার যেমন
ঝুরঝুর ক'রে শুধুই ঝরাবে বালি।
উন্মুক্ত তখন পাঁজরের শাদা হাড় ক'টা—
করুণ কাঠামো !

নিজের এ-হেন ক্ষয়,
একবারই জ্বলে ওঠা শ্মশান চিতায়
এবং অন্তিমবার—
এই ঘৃণা
স্বপ্নে জাগরণে,
অসহ্য দুপুর।

তোমার সামনে আজ তাই নতজানু,
কর জোড়ে ভিক্ষুকের আর্ত-উচ্চারণ :
তুমি এসো,
পঙক্তিতে পঙক্তিতে মিশে তোমার সত্তায়
সুবাসিত হই,
বিকেলে অন্তত—
সূর্যাস্তের আগে ॥



## রঞ্জন সরকার

### এখানে হিমযুগ

দু একটি তারা ছড়ানো আকাশ ঘিরে
একটি দুটি গাছ এখানে কেউ নেই
অতঃপর এখানে হিমযুগ
এখানে হাতছানি সমুদ্রের ডাক
প্রকৃতি প্রশ্নহীনা অন্ধ নীরবতা
এ কোন পোড়ো জমি
হাহাতপ্ত জ্বালা

পত্রহীন গাছের ডালে একটি শকুন
কাষ্ঠাসনে শয্যাপাশে সঙ্গী আগুন
স্তব্ধ আশা স্তব্ধ ব্যথা কি পরিণামে
অঙ্গ জুড়ে মিথ্যে পোশাক নগ্ন হবে ; এখানে কিছু নেই
এখানে কেউ নেই কেউ শোনে না ডাক
অবশিষ্ট গাছের পাশে দুটি একটি তারা
অতঃপর এখানে হিমযুগ
সমুদ্রের ডাক

"গল্পটা শেষ করতে পারছেন না দুর্গা দাস। চরিত্রটা বেশ মজবুত করেই...'। সে কথা থাক্। এই গল্পের বইটির লেখক গল্পগুলি শুধু ঠিক মতো শেষ করতে পেরেছেন, তাই নয়, কো-থা-য় শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য সীমানায় নিয়ে গেছেন তা বোঝা একমাত্র পাঠসাপেক্ষ।
আপনার অবশ্য পাঠ্য গল্পের বই
**সমকালের উপকথা**
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কালচেতনা ॥ কলকাতা ৩৪ □ দাম তিন টাকা।

## জহর সেন মজুমদার

### মূল

যে যার নিজের কথা বলছেন আপনারা। অথচ আমি জানি ভেতরের
একটা কথাও বলতে চাইছেন না। বাইরে শুধু মিথ্যের জারিজুরি।
যে পর্দা বাতাসে নড়ছে যে খাটে বসে পা ঝুলছে
যে কাগজে কালির দাগ পড়ছে যে টেবিল ঝুঁকে এসেছে
যে দেয়ালে ছায়া জাগছে যে ক্যালেণ্ডার পাল্টে যাচ্ছে
তারাও মানুষের সঙ্গী তারাও দ্যাখে মানুষের বেঁচে থাকা।
যে যার নিজের কথা বলছেন আপনারা। আমি দেখছি প্রতিটি মুখ
আপনি সাধু সাধু ভাব করছেন সেদিন সিঁদ কাটলেন
আপনি নদীর পাশে মুক্ত প্রেমিক মানুষের প্রতি বুকভর্তি ঘৃণা
আপনি হাত তুলে জনদরদী ভিতর ফাঁপা
আপনি নারীকে মা বলেন রাতে কামুক
আপনি স্থলে পুরস্কার সভার সভাপতি ভ্রূণহত্যাকারী
আপনি ফুল হাতে বিগলিত আঙুলগুলো বিছে
আপনি পাগলা গারদের প্রতিষ্ঠাতা নিজে পাগল নন…

---

ঃ আমাদের পরের সংখ্যা বেরুবে পূজোয় ঃ

## সমাজবিরোধী কবিতা

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব বিশিষ্ট কবির সম্মিলিত প্রচণ্ড চিৎকার একসঙ্গে পাঠকদের কানে পৌঁছে যাবে এই বিশেষ সংখ্যাটির মারফৎ। কবিরা যে সবসময় মৃদুকণ্ঠ নন, মাঝে মাঝে তাঁরাও দারুণ রেগে যান—সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে মারেন তীব্র হলাহল—আমাদের আগামী সংখ্যা তারই একটি দুর্বিনীত দলিল।

সংকলনটি পুস্তক আকারে প্রকাশের পরিকল্পনায়।



## আনন্দ বাগচী

### আমার কবিতার খাঁজবাঁক

আবেগ জিনিসটা বাষ্পের মত। কেবলই ভেতর থেকে বাইরে আসার জন্যে মাথা খোঁড়ে। সে পথ চায়; জুড়িয়ে জল হয়ে যাবার আগে বাইরে নির্দিষ্ট কোথাও পৌঁছুতে চায়। সুতরাং একটা বিশেষ মাধ্যম তার চাই, যাকে বলে আত্মপ্রকাশের আঙ্গিক। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর নির্দিষ্ট চেহারা।

একই ভাবের আবেগ থেকে কেউ গান গায়, কেউ ছবি আঁকে, কেউ বাজায়। কেউ আবার স্বোপার্জিত, স্বকল্পিত কথা দিয়ে কবিতা লেখে, কাহিনী সাজায়। আবেগস্পৃষ্ট মনের এই পৃথক পৃথক আবেগ-অভিব্যক্তি যদিও লক্ষ্যে এক—অন্তরান্তরে পৌঁছানো, এক মন থেকে অন্য মনে সংক্রমণ, দোসর খোঁজা—তবু এদের আবেদন এক নয়। একই ভাব নিয়ে ছবি হয়, গান হয়, কবিতা হয় কিন্তু এদের জন্মস্পন্দ ছন্দছাঁদ এক নয়; উপলব্ধির উপায়-উপকরণ স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য ও পারস্পর্য বদলে যায়। উদ্ভাবন-উপস্থাপনা কৌশল তাল এবং তল পরিবর্তন করে।

প্রথম কৈশোরে যখন গ্রামজীবনের পালা শেষ করে উত্তর কলকাতার খোঁয়ারে এসে বন্দী হলাম আমার মনের ভেতরে সত্যিকারের আবেগের জন্ম সেই সময়ে। কিন্তু সে আবেগের চেহারা তখনও স্পষ্ট নয় নিজের কাছেই। আত্মপ্রকাশে তখনও আমি বোবা, শুধু একধরণের স্বগত বিষাদ যেন অন্তর মন্থন করে এক উদ্বেল আনন্দের আলোড়ন তুলেছে। আমি কি করে নিজেকে প্রকাশ করব? আমি গাইতে বাজাতে ছবি আঁকতে জানি না, খেলাধুলোতেও আমার এলেম নেই! এরকম সময়ে গান আমাকে টানল, গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত। গাইতে নয়, গান শুনতে। গানের সুরে কথায় তালে আমি আত্মহারা হয়ে যেতাম, এক একটা লাইন আমার বুকের মধ্যে যেন সূক্ষ্ম চাবুকের রক্ত ছলকানো রেখার মত কেটে বসে যেত। গোপনে অপার মমতায় আমি সেই চরণ রেখাগুলোকে, সেই আনন্দ বেদনার জায়গাগুলোতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতাম। আসলে সেই বয়ঃসন্ধিতে আমি প্রেমে পড়েছিলাম, আদি-কৈশোরের যে অস্ফুটবাক প্রেমে বাঙালী মাত্রেই পড়েছেন। যে-প্রেমে পড়ার জন্যে সত্যিকারের কোন মানবপুত্রীর প্রয়োজন নেই, রূপকথার রাজকন্যার মত সোনালী রূপোলী ফ্রেমের মধ্যে মনে মনে কোন

প্রতিমা খাড়া করলেই চলে যায়। আমার জীবনে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাদুকরী লাইন ধরে সেই নারীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। ফলে কলকাতার ফুটপাথের উচ্ছিষ্ট প্রকৃতি, ছন্ন বিচ্ছিন্ন বাউণ্ডুলে গাছপালা, চিলতে কাটা রুটির গায়ে চিনি-মরিচ-মাখনের মেঘ জ্যোৎস্না রোদ মাখানো আকাশ, কৃত্রিম অ্যাকরিয়ামের মত দেশবন্ধু-হেদুয়া-গোলদীঘির জলোচ্ছ্বাস আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে। ফেরিঅলার হাঁকের মত অষ্টপ্রহরী চিল-চড়ুই-পায়রার আনাগোনা, বেয়ারিং চিঠির মত অনিবার্য কাককে দেখেও চোখ ফেরাতে পারিনি, আমার ভেতর থেকে কবিতা বেরিয়ে এসেছে। প্রথমে অক্ষর ধরে ধরে দাঁড়িকমায় থেমে থেমে, দুর্বল নড়বড়ে মিলে ভর দিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা পুয়ার, তারপর প্রমাণ সাইজ শাড়ির প্যাঁচে বেসামাল বালিকার মত মাত্রাবৃত্ত। তখন যেদিকে তাকাই কবিতা, যা কিছু ভাবি কবিতা, যেন ঘুমে জাগায় শয়নে স্বপনে কবিতা আর তিন। তখন মিল হাতড়ে বেড়াতে হত ঠিকই কিন্তু বিষয় খুঁজতে হত না হয়ে হয়ে। তিনবার পার্স খুলে এখনকার মত সঙ্গতির তল্লাস নিতে হত না, স্বতস্ফূর্ত আবেগে বুকপকেট ভারী হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। ফলে অজস্র কবিতার ফোয়ারা ফুটেছে—লেখার পরিবেশ, কবিতার বিষয়আশয় কিংবা প্রেরণার পিঠ চাপড়ানী দরকার হয়নি, ছাপার অক্ষরে মাথা গোঁজার আশ্রয় জুটবে কিনা তাও ভেবে দেখিনি। স্রেফ লেখার জন্যে লেখা, স্রেফ নিজের জন্যে লেখা যাকে বলে।

একটা শব্দের গায়ে আর একটা শব্দের ঠোকা লেগে ঠুন্ করেছে কি কান পেতেছি, তারপর জপের মালার মত শব্দাক্ষর পরম্পরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মত একটি কি দুটি ভাবাবেগ-অর্থপূর্ণ বাক্যরচনা; মুখে মুখেই, যাকে বলে মৌখিক রচনা, তাই, তারপর কাগজে পেন্সিলে হুড়মুড় করে কবিতার অনুপ্রবেশ। সেই কৈশোরে, শেষ কৈশোরে, কবিতা ছিল এইরকমই, আকস্মিক এবং অনিবার্য এবং দ্রুতগতি। সমস্ত কাজের চরাচর থামিয়ে রেখে যেন দমকল যেত, চারপাশ কাঁপিয়ে, চারপাশের মনোযোগ টেনে নিয়ে। ছন্দ কি ব্যাকরণের ট্রাফিক সিগন্যালে ভ্রূক্ষেপ না করে। সে যেন এক নেশা কিংবা জ্বরের ঘোরে লিখে যাওয়া, না লিখে উপায় নেই বলেই লিখে যাওয়া।

সে-যুগে লেখা আমার কবিতাগুলো আজ পড়তে গেলে হাসি পায়, তার বাঁচা ব্যাপারটা চোখে পড়ে কিন্তু দুটো ব্যাপার কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক, তাদের রচনার স্বতস্ফূর্ত সরলতা। দুই, আন্তরিক সততা।



এই দুটো গুণ থাকার ফলে তৃতীয় যে রম্যতা স্বভাবতই এসে পড়েছে তাকে বলা যায় গীতধর্মী মাধুর্য। তখন কবিতা লিখতাম বাইরের দিকে তাকিয়ে। সব কবিতারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দীপন ছিল আমার সেই প্রেমিকা, যাকে কোনদিন আমি চর্মচক্ষে দেখিনি। অথচ সে ছিল প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমার সহচরী, যার অস্তিত্ব নাড়ীর স্পন্দনের মত সত্য, হৃৎপিণ্ডের কপাটে যে অবিরাম অথচ অদৃশ্য টোকা দিয়ে যাচ্ছে। ফলত কবিতাগুলি চিত্রধর্মী শুধু নয়, চিত্রবহুল হয়ে উঠেছে। সমস্ত চিত্রকল্পের মধ্যে মিশে গিয়েছে এক স্বগত বিষাদ। শব্দ চয়ন থেকে শুরু করে তার সমাবেশ-সম্মোহনের মধ্যে পর্যন্ত এক বিষণ্ণ প্রেম, এক বিপন্ন বিস্ময় ক্রিয়াশীল ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এক নিখাদ ভালোবাসায় কখনো নেমেছে রক্তাক্ত সূর্যাস্ত, কখনো বৃষ্টির বোলের মধ্যে তার-সপ্তক কি ঘুঙুর বেজে উঠেছে, নির্জন নীল আকাশের নীচে শিউলি বকুলের যুক্তাভাস, বেগনী বরণ জারুলের ডাল ছুঁতে না ছুঁতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল। দেখা এবং লেখা দুয়ের মধ্যেই ছিল মনেমনের নির্জন শিহরণ, দেখা এবং লেখার মধ্যে তখন বস্তুতই কোন ফাঁক ছিল না। এই ধরণের কবিতা এখন আর আমি শত চেষ্টা করলেও লিখতে পারবনা। তাই কবিতার, বিশেষ করে প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে বয়স মানতেই হয়। একটা বিশেষ বয়স ছাড়া এসব লেখা সম্ভব নয়।

কবিতার সেই আবেগ-পর্বে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, শব্দই ছিল কবিতার মূল সূত্র, তার আপাত নিরুদ্দেশযাত্রার কাণ্ডারী। অর্থাৎ শব্দের ঝংকার, শব্দের অর্থময় হাতছানি, কবিতার চরণের পর চরণকে, আকস্মিক মিলের লয়কারী আলিঙ্গনেরমধ্যে পঙক্তিগুচ্ছময় স্তবককে এবং পরিণামে একটি সম্পূর্ণ কবিতাকে টেনে এনেছে। সামগ্রিক জীবন দর্শন তখনও গড়ে ওঠেনি, জীবনের গভীর উপলব্ধির বদলে তখনও ছিল খণ্ড অনুভব ভাবনার সমীকরণ।

এই ভেসে বেড়ানো অবস্থা থেকে জীবন একদিন হঠাৎ টেনে নামালো কঠিন মাটির ওপরে, অভিজ্ঞতার জগতে। জীবনকে সরাসরি মুখোমুখী জানবার সময় এল। অনেক ভালো লাগার রঙ বদলে যেতে থাকল, পালটে গেল সুন্দরের সাধারণ সংজ্ঞা। আবেগ উচ্ছ্বাস স্তিমিত করে মস্তিষ্কের জবরদখলে চলে গেল দৃশ্যজগৎ, প্রত্যয় এবং উপলব্ধি। জগৎ এবং জীবনে যা নির্মম, যা সত্য, যা অনিবার্য কবিতায় তার রাস্তজমি তৈরি হতে থাকল।

আমার কবিতার এই দ্বিতীয় পর্বে গদ্য এসে গেছে দ্বিতীয়পক্ষের মত।

এ-কে অবৈধ অন্যমনস্কতা বলব না, তবে মনের পাল্লা যেন গদ্যের দিকেই ঝুঁকেছে বেশী। ঘোমটা খোলা নারীকে স্বল্প আবরণে দেখার প্রলোভনের মতো গদ্যভাষার সরাসরি একটা আকর্ষণ আছে। গদ্য সহজেই জনপ্রিয়। তার বহুল প্রচারের মধ্যে শারীরিকতা এবং সাংসারিক জলুষ অনেক বেশী। সে গদ্য আবার যদি হয় গল্পের গদ্য, কাহিনী-জমানো গদ্য। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠার আগে, কাঁচা বয়সের ঝাঁজ এবং ঝোঁক-ঝুঁকি থাকে কবিতার মধ্যে। সেই বয়ঃসন্ধিক্ষণে গদ্যের সঙ্গে সহবাস বিপজ্জনক। তাতে উভয়েরই চরিত্র নাশের আশঙ্কা। দুই বিপরীত ফেরুর আকর্ষণে গদ্য হয়ে ওঠে কাব্যিক, ভাবালু, উপমাবহুল। আর কবিতা তার গীতধর্মী চুম্বকক্ষমতা হারিয়ে ঈষৎ স্থূল এবং গদ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার উভয় সাহিত্যচর্চাই জখম হয়েছে এইভাবে। একান্ত মনোযোগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। কিন্তু কবিতা কিংবা গদ্য কোনটাকেই ছাড়তে পারিনি। এই অবস্থা কতদিন চলত, এর পরিণাম কি হত আমার জানা নেই, তবে আমি সম্ভবত বেঁচে গেলাম অন্য উপায়ে। আমি অন্যের প্ররোচনায় একটি দীর্ঘরচনায় হাত দিলাম। এই রচনাটি কিস্তীতে কিস্তীতে লেখার দরুণ রচনাকাল স্বভাবতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, এবং বলাই বাহুল্য লেখাটি ঐ সময় ধরে আমার মনকে নিবিড় নিবিড়তর করে টেনে রেখেছিল। এই রচনাটি ছিল কবিতায় উপন্যাস, যাকে বলে কাব্যোপন্যাস। গল্পের সঙ্গে, কাহিনীর মধ্যে সমসাময়িক চিন্তা-ভাবনা, আবেগ বিশেষ দৃষ্টিকোণ নিয়ে জুড়ে গেল। কবিতা এবং গদ্যের মধ্যে সন্ধি ঘটানোর সেটা ছিল পহেলা খসড়া, প্রথম সচেতন এবং সত্যিকারের প্রচেষ্টা।

এই একটা রচনাতেই আমার কবিতার ফর্ম এবং এক্সপ্রেশন বদলে গেল অনেকটা। কবিতা এবং গদ্যের আপোস একটা ঘটে গেল ঠিকই কিন্তু তা কেবল স্বকাল পুরুষ নামক এই কাব্যউপন্যাস রচনার ফলেই, তা নয়। সমীকরণের চেষ্টা দু-তরফেই চলেছিল। কবিতা যেমন কাহিনী আঁকড়ে কঠিন এবং বহির্মুখী হবার চেষ্টা করেছিল, আমার গদ্য রচনাও তেমনি ইমোশনধর্মী হয়েও দ্বিধা কাটিয়ে স্পষ্টভাষী এবং অলঙ্কারমুক্ত হবার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে ঐ সময়কার দু ধরনের রচনা আমাকে সাহায্য করেছে। এক, রহস্য গল্প এবং উপন্যাস। দুই, ছদ্মনামে লেখা কিছু ব্যঙ্গকৌতুক নক্‌শা। ভাষায় পোলবতা-পালিশের বদলে সপ্রতিভ খর-তীক্ষ্ণতা আসবার চেষ্টা, মুখের কথার স্বরভঙ্গিমাকে সাহিত্যিক শ্রুতিলিখনে ধরবার আয়াস হচ্ছিল। এই সঙ্গে



অনুবাদের কথাও স্মরণ করতে হয়। দুটি ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা তর্জমা করতে গিয়ে বিষয় ও বক্তব্যঘটিত বাধ্যবাধকতা এবং আক্ষরিক অনুশাসন গদ্যের রাশ টেনে ধরে সংযমের শিক্ষা যে একেবারে দেয়নি তা বলতে পারিনা। কাহিনী ব্যাপারটাই এমন যে সে ভাষাকে দাঁড়াতে বা থেলতে দিতে চায় না। তার হাতে থাকে উদ্যত গতির চাবুক। তারপর, তারপর তারপর, সে কেবলই সামনে ছুটিয়ে নিয়ে চলে। ঘোড়ার মতই দুচোখের পাশে ঠুলি পরিয়ে দেয়, ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি নিষেধ. পেছনে তাকানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ বর্ণনার যে প্রলোভন, উপমার পর উপমা সাজিয়ে ছড়ানো আলোয় অনেকখানি টেনে আনা, মূল থেকে শাখা-প্রশাখায়, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে—সে চলবে না।

গদ্যের কথা থাক; আমাদের আলোচ্য পদ্য, অর্থাৎ কবিতা। আমার কবিতা পরিণামে নতুন পথ নিল। তার আদবকায়দা; তার আদল যেমন বদল হল, তেমনি তার বিষয়, ভাবভাবনা। আদিপর্বে ছন্দের তালতরঙ্গ আমাকে টেনেছিল বলেই নানারকম ছন্দের চর্চা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কবিতা হয়ে পড়েছে ভাবগম্ভীর; প্রেমের প্রাদুর্ভাব কম, তাছাড়া প্রেমের মধ্যেও আর বয়ঃসন্ধির আকুলতা মেশে না, শারীরিকতা শিহরণ তোলে না। এখন প্রেম মানেই স্মৃতি, বিচ্ছেদ পুনর্বিচার। অভিজ্ঞতার কটুকষায়। এখন জীবন মানে মানুষের রঙীন আলো নয়—আগুন, আয়ু। জ্বালাময়ী অবতরণ, নিঃসঙ্গ নির্বাসন। জীবন এখন বিরোধাভাসে ভরা, দিনগত পাপক্ষয়ের আপোস। জীবন অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ। তাই মৃত্যুর নাম-ভূমিকা নানারূপে এখনকার কবিতায়। বুদ্ধির অগম্যতায় এসে জিজ্ঞাসু স্তব্ধতা। কবিতা তাই বেছে নিয়েছে ভারবাহী পয়ার, অমিল পয়ার। যা নিঃশর্ত, অদায়বদ্ধ। সে-পয়ারও মাঝেমধ্যেই খণ্ডিত, ভেঙে ভেঙে টুকরো করা। পঙক্তি ছুট, স্তবক ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা প্রবহমান পয়ারের মত কখনো কখনো। চলিত রূপের মধ্যে সাধু ও কথ্য শব্দের অনুপ্রবেশ এবং মিশ্র ব্যবহার ভাষার চরিত্র এবং চাল কিছু পালটে দিয়েছে অবশ্যই কিন্তু সেই আবেগ আর ফিরে আসেনি।

## কেদার ভাদুড়ী

### মনে পড়ে

ওরাতো ওখানে প্রেম করে
সামনে নদী-জল
পেছনে বনবীথির পেছনে বনবীথির সমান্তরাল
দিগন্ত অবধি নীল চিল উড়ে গেলে

আমিও লুকিয়ে মুখ প্লাষ্টিক চাদরে
ঘরে গিয়ে বউকে বলব, বউ, মনে পড়ে ?

## জয়ৎ সেন

### ভালোবাসার ওপিঠ

পৃথিবী,
তুমি এতো নির্মম বলেই না
আমি আজ ভালোবাসার ওপিঠ দেখতে পেলাম।
তোমার আস্তাবলে গিনিপিগেরা উত্তর বাতাসে

চাঁদের উজ্জ্বল দিকে চেয়ে
কোন্ যাদুকরী শক্তি দিয়ে ঝুলনে বেঁধেছ।
সে কি দ্যাখে রাতের ফুটপাত হঠাৎ ঢালু হয়
নারী ও পুরুষের ওমে গড়িয়ে চলে যদুবংশ

শনির বলয়ে বসে চতুর্দশ চন্দ্রের অমা-পূর্ণিমা
বিবেকের মতো অহর্নিশ বিপরীতে ঘোরে
কান্নার মৈথুনে জমে অবাক যন্ত্রণা

পৃথিবী,
তুমি এতো নির্মম কঠোর বলেই না
আমি আজ ভালোবাসার ওপিঠ দেখতে পেলাম।



## সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

### ভালোবাসি তোমাদের

এইমাত্র আমরা পেরিয়ে এলাম
আর ছুটন্ত বাস থেকে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম
জল, মাটি, অন্তরীক্ষ আলতো ক'রে ছুঁয়ে হাওড়া ব্রীজ
ওষ্ঠে প্রবীণ মন্ত্রীর একমাত্র সম্পদের মতো মৃদু হাসি।

য়্যুনিয়ন বোর্ডের গম্ভীর রাস্তার ওপারের জলাভূমি ছাড়িয়ে
দিগন্তের ঠিক এই পারে উঠে এসেছে চাঁদ।
কিছু না দেখার মতো এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে
উঠোন, রাস্তা, চিকন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে মতিবিবি।
তার মনে পড়ে জলার ওপার থেকে
গুলি খাওয়া একমাত্র ছেলের দেহটাকে
ওরা সবাই এই রকম সন্ধ্যায় নিয়ে এসেছিলো।
তাদের পদক্ষেপে শোক, চোখের নীচে নিঃশব্দ ক্রোধ দেখে
মতিবিবির চোখের জল নদী হয়ে নেমে আসেনি।
সেই মিছিলের একজন আজ এম.এল.এ.
এখন শহীদের মা মতিবিবি
তার বারান্দায় বসে থাকে অনন্ত সকাল।

পড়ন্ত বিকেলে কুমারী নদীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম
কালো আদিবাসী যুবতীর সিঁথিতে স্পষ্ট সিঁদুর,
সামনে পেছনে উঠে গেছে পাথুরে প্রান্তর।
আমি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি এইখানে
সাইকেলে বারোমাইল পেরিয়ে গ্রামে ঢোকার পথে
ইগ্‌লুর মতো অন্ধকারে এখানে সেখানে কিছু কুঁড়েঘর।
পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বন্যা
আমার আত্মীয় যিনি কম্যুনিষ্ট বলে গর্ব করতেন
আমি দেখলাম তাদের সংঘবদ্ধ অদ্ভুত নির্মাণ কৌশল।

নাগরিক সমাজ সভ্যতা থেকে বহুদূরে
এইখানে নিঃস্ব উপত্যকায় মোটর সাইকেলের উদ্ধতগতি,
পঞ্চায়েত সদস্যের ঘরে রেডিও ফুলকো লুচি, ট্যালকম পাউডার,
এই দেশ আমার দেশ
আমি দেখলাম পুরুলিয়া আর গড়িয়াহাটের হাসি এবার কম নয়
আমি দেখলাম প্রাক্তন বিপ্লবী স্বপ্ন পুড়িয়ে ফেলে এখন এম.এল.এ।
আমি দেখলাম শত শত স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা লাখ লাখ মানুষ
আকাঙ্খা ভুলে শুধু হাঁটছে আর হাঁটছে।
এই দেশ আমার দেশ
যাঁরা জাতীয় ঐক্যের নেশায় কাটাচ্ছেন দিনমাস বছর।
তাঁরা শ্রদ্ধেয়, সম্ভবত কোনো একদিন নিশ্চিত মন্ত্রী হবেন।
আর কালো মানুষেরা
আমি তোমাদের, শুধু তোমাদের বড় ভালোবাসি।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কেউ কেউ বলবেন
শ্রেণী ও সমাজ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা অসীম।
তাদের জানিয়ে রাখি
আমি কম্যুনিস্ট না হয়েও
সি-আর-পির রাইফেল-এর তাড়ায় দৌড়ে গেছি মাইলের পর মাইল
কোম্বিং-এর আশঙ্কায় মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে ভিজেছি কতোবার
আমি কংগ্রেস না হয়েও
ট্রেডইউনিয়ন নেতার ব্যক্তিগত আক্রোশে
টুকরো হয়ে যেতে দিয়েছি আমার শান্তি,
ফুটে ওঠা ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে তার রূপ দেখার বদলে
ভেবেছি, যদি কিছু হয় যদি হয় যদি হয় যদি…।
আমার মা, বোন আর ভায়েদের কি হবে?
ভেসে যাওয়া সদ্যপ্রসূত বাচ্চার জন্যে
পাড় ধরে মাইল মাইল দৌড়ে যায় একটি গাভী।
এরকম অলৌকিক দৃশ্যের কাছে এলে
ইতস্ততঃ ছড়ানো শহীদের মা মতিবিবিদের কথা মনে পড়ে।



তবু মন্ত্রীরা যেখানে বসেন
রাইটার্সের সেই সংরক্ষিত এলাকায়
মতিবিবিদের কারো পদচিহ্ন নেই, থাকেনা কখনো।

পুকুরের সংকীর্ণ চাতালে বসে বাসন মাজছে দক্ষিণের জনৈকা মহিলা
তাকে বললাম, কিগো ; মাসি, সেই যে মেয়ের অসুখের কথা বলেছিলে
সে এখন কেমন রয়েছে।
সামান্য মুখ তুলে মাসি মাথা নাড়লো, সে নেই,
চতুর্দিকে ঝন্‌ঝন্ শব্দ উঠলো না, আকাশ ভেঙে পড়লো না
তবু আমি দেখলাম,
শোকার্ত মহিলা প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ মুহূর্তে তার কোনো ব্যবধান নেই।

সামান্য হেলে পড়া বিকেলে জানলার সামনে আমি বসে আছি
সামনে ফ্লাওয়ার-ভাসে একগুচ্ছ সাদা ফুল।
দুপুরের অসফল চুম্বনের জন্যে আমি হয়তো অসুখী
এই ভেবে তিনবার ইতস্ততঃ ঘুরে গেলো আমার প্রেয়সী।
আমার পুষ্প প্রেম কিছু বেশী নয়
যা আমাকে বসিয়ে রাখবে তার রং ও রূপের মুখোমুখি।
খোলা জানালার ওপারে সাদা আকাশের দিকে চেয়ে
ওগো শহীদেরা, আমি তোমাদের জন্যে ছড়িয়ে দিলাম আমার মমতামাখা ফুল
শুধু জেনে গেলে ভালো হতো
ধাবমান সময়-সমাজ তোমাদের নিয়ে, আজকাল আদৌ ভাবে না।
আরো বহুদিন আমরা লুণ্ঠিত হবো জেনেও
হত্যাকারীদের জন্যে তোলা রইলো, আমার ঘৃণা আর অসহযোগ।
ওগো কালো মানুষেরা
কালো দিবস-যাপন বড় ক্লান্ত করে, ক্লীব করে, ক্রোধহীন করে।
এই দেশ আমার দেশ
আরো বহুদিন অশ্রু লুকিয়ে ফেলে হেঁটে চলে যাবে
শুধু ভবিষ্যৎবিহীন প্রিয় কালো মানুষেরা
আমি তোমাদের বড় ভালোবাসি, ভালোবেসে যাবো।

## তেজেশ অধিকারী

### সম্রাটের কাছে নয়

সম্রাট, এখন কবিদের রাজ্যপাট তোমার পৃষ্ঠপোষকতা পায়না
কবিদের সব শ্লোক  এখন মানুষের কাছে
কাপুরুষের কাছে
ঘৃণ্য শূকরের কাছে
প্রয়োজনীয় উত্তাপে দিনের পর দিন গলে যাচ্ছে।

কারণটা তুমিও জান। কারণটা আমিও জানি।

দিন দিন তুমি তোমার আবরণ মুক্ত হচ্ছ, তুমি তোমার
নগ্নতার ভেতর সারা ভারতবর্ষকে শেখাচ্ছ
নিটোল বেলেল্লাপনা, সার্বিক
অসুস্থ আবহাওয়ার কেন্দ্রীয় সংবাদ।
দিন দিন কত কবি লিখে যাচ্ছেন তোমাদের তুষ্টির জন্য
ক্যাবারের লাল জলের মহিমা
যৌনতার অসম্ভব পণ্যের বাজার।

এ ছাড়া আর করার কিছু নেই। দিন দিন
ভারতবর্ষ কত উদার এবং মহত্বে  ছোট
খুব ছোট হয়ে আসছে,
নতজানু হবার মতো একটাও পীঠস্থান নেই।

কলকারখানা, নদী, মাঠ, আকাশের চাঁদ
সবকিছু দূষিত করে
কী পরম সুখে আছো সম্রাট, তুমি সম্রাট—
কী পরম সুখে আছে ভারতবর্ষের ছোটলোক
অপাংক্তেয় মানুষেরা—



যাদের হাড়ের মূল্যে পরাজিত দধীচির ঘ্রাণে
তুমি তো উন্মাদ নও, গড়ে তোল তোমার ইচ্ছার সৌধ
বাজিকর, তুমি বাজিকর।

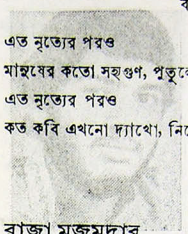

এত নৃত্যের পরও
মানুষের কতো সহ্যগুণ, পুতুলের কতো সহ্যগুণ
এত নৃত্যের পরও
কত কবি এখনো দ্যাখো, নিজেদের চামড়া বাঁচায়।

## রাজা মজুমদার

### শব্দ থাকলেই প্রতিশব্দ

শব্দ থাকলেই প্রতিশব্দ
এবং অবশ্যই
কখনও প্রকাশ্য কখনও নয়
উৎস আর প্রতিফলক
জড়াজড়ি বা খুব কাছাকাছি—
প্রতিশব্দ শব্দের সঙ্গে মিশে যায়।

উৎস আর প্রতিফলক
দুজনে খানিকটা দূরে গেলেই
দুজনেই স্পষ্ট
প্রতিশব্দ উড়ে আসে শব্দের আহ্বানে

সলিল লাহিড়ীর একমাত্র কবিতার বই
**ছায়া প্রতিচ্ছায়া**
বিশ্বজ্ঞানে বোধহয় এখনো পাওয়া যেতে পারে।

## ।। আশির দুই দুঃসাহসী আগন্তুক ।।

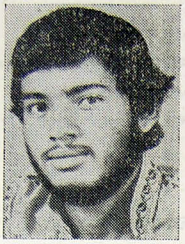

প্রবালকুমার বসু

কবি ও কবিতার চার দশকের অকৃত্রিম বন্ধু, দেবুদা, দেবকুমার বসুর একমাত্র পুত্র প্রবালকুমারের বয়স মাত্র কুড়ি। জলপাই-গুড়ি সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিকাল বিভাগের এক উজ্জ্বল ছাত্র। দক্ষ সাঁতারু প্রবালকুমার ১৯৭৮-এ জুনিয়র লাইফ সেভিং পরীক্ষাও পাশ করে ফেলেছে। স্কুল জীবনে কামাই করেনি একদিন-ও, পিতামাতার প্রতি তার ভক্তি প্রায় মধ্য-যুগীয়। ওঁদের প্রণাম না করে শুরু করে না দিনের কাজ। ইতিমধ্যেই ওর কিছু প্রকাশিত কবিতা ঘনিষ্ঠ পাঠকের নজরে এসেছে।

শান্তনু লাহিড়ী

কৃতী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জীবনে খুব উঁচু মাপের প্রতিষ্ঠা পেলেও শান্তনুর বাবা সলিল লাহিড়ী বাংলা কবিতা ও সাহিত্যে এক নিরহংকারী অভিযাত্রী। বোধকরি রক্তের সেই অম্লান বীজাণু বাল্যকাল থেকেই শান্তনুকে ছুঁড়ে দিয়েছে কবিতার দুরন্ত দহনে। সবে মাত্র উনিশে পা দিয়েছে শান্তনু। কিন্তু লাজুক নম্র স্বল্পবাক এই ছেলেটির ফুসফুসে যেন দুঃসাহসী অস্থিরতা। সুদূর ভিজাগাপত্তনামে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ভর্তি হলেও কবিতাই তার নিয়ত সাধনা। মাত্র দুচারটি প্রকাশিত কবিতাতেই বোঝা গেছে, নিজেকে তৈরী করছে শান্তনু।



## প্রবালকুমার বসুর কবিতা

### আমার প্রশ্ন

মুখ ঢেকেছো, বুক ঢাকোনি
কেমন কথা—
এমন বাচাল
কে করেছে ?
করেছে কে ?
আমার রইল এই প্রশ্ন
টিলার কাছে।

### এই মুহূর্তে এই ইচ্ছা

এখনো আমি আর কটা দিন যেভাবে হোক বাঁচব
এই মুহূর্তে এই ইচ্ছাই, গোপন করে রাখব
অনেক কাজ এখনো বাকি দোহাই তুমি দিও না ফাঁকি
দুঃখের ইটে এবার আমি সুখের ঘর গাঁথব।

এখনো আমি আর কটা দিন যেভাবে হোক বাঁচব
পারলে প্রজাপতির মত ফুলের উপর থাকব
বেঁচে থাকার এদেশটাতে হয়েছি সব হাড়হাভাতে
শুকনো ফুল সুতোয় এবার গাছের ডালে বাঁধব।

এখনো আমি আর কটা দিন যেভাবে হোক বাঁচব
এই মুহূর্তে এই ইচ্ছাই, গোপন করে রাখব।

## আমার চাওয়া

যদি আরো হাজার বছর তোমার সাথে থাকতে পারি
চাইনা তখন কোনো কিছুই—সহর, গাড়ী, অন্য নারী
একটুখানি আমার চাওয়া, এইটুকুই
হাজার বছর তোমায় পাওয়া এইটুকুই।

## রাত্রে বিশ্রাম বড় কষ্টকর

নারীর শরীর থেকে ফিরিয়ে আনি শরীর
বড়ই কৃপণ হয়েছি—
ভালোবাসা নয়, নিজের শরীর থেকে কিছু দিতেও
ব্যথা পাই,
রাতে বিশ্রাম করি না, কারণ—
নারীর পাশে অন্ধকারে চোখ বুজে থাকা বড় কষ্টকর।

সারাদিন পথ হেঁটে যে পথিক এক্ষুনি পৌঁছাল
তার একটু বিশ্রামের দরকার,
যে পথ দিয়ে তুমি এসেছো পথিক,
সেখানে কি কোনো গাছ নেই?
তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে পৌঁছালে—
আমি তো পারলেই গাছের কাছে যাই—তাই এত দেরী—
তবুও তোমার বাকিটা পথ আমিই পার হব অন্ধকারে।
কষ্ট হবে—
তার থেকেও বেশী কষ্ট চুপ করে নারীর পাশে অন্ধকারে শুয়ে থাকা
নিজের শরীর থেকে তাও কিছু দিতে ব্যথা পাই।

পথিক, তুমি বিশ্রাম নাও
তোমার বাকিটা পথ আমিই পার হব।



# শান্তনু লাহিড়ীর কবিতা

## তার উদ্দেশ্যে

আমার জগৎ-এর গণ্ডি যে টেনেছে—
কিছুটা ভালবাসায়
কিছুটা বা ঘৃণায়,
যে আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে
—পাড়ে তুলেছে,
যে আমার মরণ এবং স্বপ্ন,
সেই তাতেই—
বিলীন্ হোক্ আমার সব কাব্য।

## ভীষণ ভারী

কিছু রাত ভীষণ ভারী হয়,
বাতাসে ছড়িয়ে থাকা জলকণা
এসে ঠেকে কপালে।
তারাদের মাঝ থেকে কিছু স্মৃতি
আচমকা আক্রমণ করে।
সে মুহূর্তে একা বসে থাকা
—আত্মকেন্দ্রিক্ আমিকে।
সমুদ্রের মন-মাতানো হাওয়াও
পরিণত হয়—টাইফুনে।
চাঁদের জ্যোৎস্না আলো-ও
গলায় চেপে বসতে থাকে—
কিছু কিছু রাত যখন ভীষণ ভারী হয়,
যখন বাতাসে ছড়িয়ে থাকা জলকণা
—কপালে এসে ঠেকে।

## ডাইরীর পাতায়

পায়ের তালুতে নাচাতে নাচাতে
এক সময় ঠেলে দিলুম—একধারে।
সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে
সমস্ত দেশ কালো করে দিয়ে
নেমে এল রাত্রি।
ডাইরীর পাতায় সমস্ত সময়ের
সংক্ষিপ্ত সারাংশ লিখে
অমূল্য দিনটাকে বন্দী করলুম।
ঊষালগ্নে দিনের শুরুতে
আবার পায়ের তালু নাচাতে লাগলুম,
দিনটাকে একসময়—
ডাইরীর পাতায় বন্ধ করবার জন্য।

## কিছু কথা

সব কথা—কথা হয় না,
হাল্কা চালে চলতে গিয়ে
কিছু কথা আটকে যায়,
কিছু কথা মরুভূমিতে পিপাসিত হয়ে
অকস্মাৎ মৃত্যু বরণ করে,
জলের মধ্যে ডুবে যায় কিছু কথা,
কিছু কথা জলে সাঁতার কাটতে কাটতে
পথ ভাঙতে ভাঙতে
—গেঁথে যায় মর্মমূলে।
পোড়াতে থাকে অন্যকে।
এমন কি সেই দাবানলে বাদ যায় না
সে নিজেও।



## অমিতাভ দাশগুপ্ত

### পদ্যের চাঁড়াল

আমি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বা শ্যামাচরণ দে-র বাড়ির ছেলে নই। রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে-র মত রূপোর দূরে থাক, কাঠের চামচে মুখে নিয়েও জন্মাইনি। খুবই নিম্ন মধ্যবিত্ত, ভাঙা বাঙলার এক কালো, রোগা খর্বুটে মানুষ, ডাইনে-বাঁয়ে কুলোতেই যার ইস্তেকাল এসে গেল প্রায়। বিরাট একান্নবর্তী সংসারে মা সারাজীবন বিনি মাইনের ঝি-গিরি করেছেন আর বিয়ের সময় পাওয়া সোনা-দানার যা দু-এক টুকরো বুক দিয়ে অভাবের কামড় খেয়ে বাঁচিয়েছিলেন, তাই বেচে বেচে এক একটা পরীক্ষার ফীজ্ দিয়েছিলেন বলে বরাতজোরে খানিকটা লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছিল। সোজা কথা, আমার পাঁচশো মাইল রেডিয়াসের মধ্যে কোথাও পদ্যের 'প' ছিলনা। তাহলে? তাহলে প্রায় সাতাশ বছর ধরে পাতার পর পাতা এত সময় আর এত কালি খর্চা করা কেন?

আসলে, আমি হচ্ছি সেই লোক, চারপাশ থেকে অনবরত মার খেতে খেতে যার ভেতরে একটা রোখ জন্মে যায়। তখন তার অবস্থা হয় অনেকটা ডন কুইকসটের মত। বরাবরই আমার শরীর হাড়সার, দুর্বল। ছোটবেলায় ওয়েলিংটনে এস.ও.পি.সি-তে ইন্টার-স্কুল বক্সিং দেখতে যেতাম। সে ফ্লাইওয়েট, ব্যান্টামওয়েট বা লাইট হেভি-তেই হোক সেন্টলরেন্স, লা মার্টিনেয়ারের বঙামার্কা অ্যাংলো ছেলেদের হাতে বাঙালি ছেলেরা প্রচণ্ড মার খেত, প্রায়ই নক্‌ড আউট হত। আমার বুক জ্বলতে থাকত, চোখে জল এসে যেত। হঠাৎ হঠাৎ এক একটি দিশি ছোকরা রুখে দাঁড়াত, বেদম পিটিয়ে চিট্ করে দিত ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে লম্বা চওড়া কোনো ফিরিঙ্গি তনয়-কে। আর আমি বিপুল উত্তেজনায়, চারপাশের সব কিছু বেমালুম ভুলে, সীটের ওপর দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে উঠতাম 'কিল হিম, ফিনিশ হিম।' আজও ক্রিকেট টেস্টে অষ্ট্রেলিয়া বা ইংলণ্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ জিতলে আমি খুশি হই। ওলিম্পিকের স্প্রীণ্ট্ ইভেণ্টে বিজয়-বেদিতে আমি নিগ্রো তরুণ ছাড়া কাউকে কল্পনা করতে পারিনা। তাই কোনোদিনই আমার হীরো শাদা বজ্জাত হিটলার নয়, কালো ক্ষিপ্র জেসি ওয়েন্স বা ব্রাউন

বস্থার জো নুই।

আমি আর আমার গরীব বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গদ্য-পদ্য লেখার ব্যাপারটাও এসেছিল এমনি এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে। শিল্প-সংস্কৃতির দুনিয়ায় ওল্ড ক্যালকাটান ঠাকুর, দে বা দত্ত বাড়ির ছেলেরা যদি টিপিক্যাল নর্ডিক হন, আমরাও তবে টিপিক্যাল নিগ্রো বই আর কিছু নই। ওঁদের টাকা পয়সা রূপ বংশগরিমা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে অবাধ, অলস, দুশ্চিন্তাহীন ভাবে পদ্য লেখার অবকাশ আছে, আছেন যদু ভট্ট রোমাঁ রোলাঁ, অ্যানি বেসান্ত, হুম্‌ফ্রে হৌস—আমাদের কিছু নেই। ফলে, আমাদের লড়াই-এর সঙ্গে ওঁদের লড়াই-এর কোনো তুলনাই হয় না। স্রেফ বেঁচে থাকাটাই আমাদের কাছে কী অসম্ভব, রক্তক্ষয়ী ব্যাপার তার এক ফোঁটা আঁচ গায়ে লাগলে ঠাকুর-দত্ত-দে বাড়ির বিলাসী তরুণদের আর পদ্য লিখে লিখে নোবেল বা জ্ঞানপীঠ পেতে হত না। তারা ফ্লোরেন্স নামে একটি ফরাশি যুবতীর সঙ্গে দমদমে এক বন্ধুর বাড়ি আমার আলাপ হয়েছিল। সে কিন্তু একটা দারুণ কথা বলেছিল আমাকে। বলেছিল—তোমাদের, কলকাতার লোকজনের কোনো তুলনা হয় না। নোংরা জল আর ভেজাল খাবার খেয়ে ট্রামে বাসে মরতে মরতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং মেনে নিয়ে, যখন তখন হামলা আর বোমাবাজির সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যে-রকম অলৌকিক উপায়ে তোমরা বেঁচে আছ, তার শতভাগের এক ভাগ কষ্টে আমরা কবে ফৌত হয়ে যেতাম। নড়বড়ে সংসারকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মুখে রক্ত তুলে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে হঠাৎ হঠাৎ কোনোদিন এক চিল্‌তে কাগজ জোগার করে পদ্য লিখতে বসলে আমার তারা ফ্লোরেন্সের কথাটা মনে না পড়ে গিয়ে পারে না।

হ্যাঁ, এ একরকম বিদ্রোহ বা জয়-ও বটে। ভালো হোক, মন্দ হোক, শূদ্রক আমি, সাতাশ বছর অসীম স্পর্ধায় নিষিদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণের মত পদ্য লিখে যাচ্ছি। কর্তাদের তাকিয়া ঠেস-দেয়া সাজানো আসরে আমি রাজ্যের ধুলোকাদা পায়ে ঢুকে পড়েছি ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমার পদ্য লেখার বা বাঁচার যেটুকু অহঙ্কার, তা ঐ ধুলো থেকেই সটান উঠে দাঁড়িয়েছে। না মেরে ফেলতে পারলে হাত থেকে কেউ ঝাণ্ডা কেড়ে নিতে পারবে না।



## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

### অসমাপ্ত কবিতার ওপরে

অসমাপ্ত কবিতার ওপরে ছড়িয়ে ছিল ঘুম
চুলগুলি এলোমেলো
অসুখী মাথাটি রাখা খাতার হৃদয়ে
যেন সে আদর চায়
কবিতার কাছে চায় কিছুটা উষ্ণতা
গুটিসুটি শরীরটি ছোট হয়ে আছে
কেমন করুণ, ক্লান্ত, ঘুমের প্রাঙ্গণে অসহায়
সেই কবি!
সারারাত জ্বলে থাকে আলো
জানলার ঝিলিমিতে ঝরে অভ্রফুল, তুষারের মত
সাজানো অক্ষরগুলি চেয়ে থাকে, দ্যাখে
রেফ, ও রয়ের ফুট্‌কি, তাদেরও বলার আছে কিছু
আর সব ঠিকঠাক থাক
মানুষ মিলিয়ে যাক মানব সমাজে
পৃথিবী নিজের মতে ছুটুক উন্মত্ত বায়ুযানে
একজন কবি শুধু অসম্পূর্ণ
কবিতার খাতা খোলা, পাশে তার ঋণী মুখখানি
তার দুঃখ স্পষ্ট চেনা যায়
লেগে আছে ঠোঁটে ও কপালে।

---

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বিতর্কিত এবং আলোচিত
আশিস সান্যালের
নতুন কবিতার বই
যেতে যেতে
খুব দ্রুত প্রকাশের পথে

## সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

### পরিবর্ত

যে তোমাকে লক্ষ্য করে, তাকে তুমি দেখোনি একবারো!
তুমি তো বিভ্রম চাও, চুলে, স্তনে, বোধক অধরে
চাও অনবদ্য স্তুতি, চাও রমণী জন্মটি শুধু রমণীয় হয়ে থাক ; অন্ধকারও
নক্ষত্রপুঞ্জের দুএকটিকে আলাদা বিশেষ করে
তুলুক। তোমার সংকীর্ণ কাঠামো তাই বারংবার যায়
নিকট পরের কাছে, যে তোমার পাশের চেয়ারে বসে
আপাত নিরীহ বাক্য হাস্য ও উল্লাসে
উপলক্ষ্য বা অলক্ষ্যে তোমাকে ছুঁতে ভালবাসে,
ডানহিল ধোঁয়ায় ঘর ছেয়ে যায়, তাম্রকূট
অমন তামস স্বপ্ন! যেন ব্যর্থ পিকনিক, যেন গোপন অস্ফুট
একটি গভীর নদী মাটির ওপরে আর উঠে এলোনা, কেবল
নর ও নারী নিঃসরণে ভিজে গেল পৃথিবীর সুপ্রাচীন ঘাস,
একজনের কথায় আরেকজন হাসলো ; আরেকজনের চোখের জল
একজনের চোখেও কিছু সামাজিক জলচল জাগালো।
ওহে! তুমি কি এরই নামকরণ করেছিলে "যৌন রাজনীতি ?"
কাছাকাছি থাকা, অথচ রাত্রি ছাড়া একবারো
লক্ষ্য না করা পাশে যে উত্থানপদ ভালবাসা
সে সংগঠনে আছে তো ?
তাকে মাংসের খানিক বেশী আশা করা যায় তো!

অথচ যে দূর থেকেই জেনেছে
তোমার করুণ জরা, লক্ষ্য করেছে, একটিও উপমা আর
"তুমি" সর্বনামটিকে কেটে লেখা যাচ্ছেনা! এখন, এক্ষুনি একবার
অদূরে পাঠাও চোখ
দেখ মানুষ কি করে নির্বাচন করে
মানুষীর জন্য কিছু নির্বাসিত শোক!



## অজিত মৈত্র

### এখনো হয়তো

আজকাল
চেনা জানা বাড়িগুলোও
ভয়ংকর অচেনা
সব দরজায়
সশস্ত্র পুলিশ
সব দরজায়
প্রবেশ নিষেধ
আজকাল
চেনা জানা বসতিও
ভীষণ বিদেশ!
তবুও এখনো হয়তো
একেকটা দরজা বুঝি আজো বেঁচে আছে
যেখানে
যখন তখন
হুড়মুড় করে ঢুকে পড়া যায়
উঠোনে
তুলসীর ছায়া
চন্দনের গন্ধ উড়ছে ঘরের আকাশে।

বি.দ্র: এই কবিতাটি আসলে একটি চিঠির প্রতিলিপি। কেবলমাত্র কয়েকটা শব্দ যোগ বা বিয়োগ করেছি। লাইনও ভেঙেছি। ব্যক্তিগতভাবে কবির অন্তর্নিহিত কবিত্ব চিনি বলেই কবিতার জন্য তাঁকে তাগাদা দিয়েছি বারবার। পাইনি, বলাই বাহুল্য। ফলত এই প্রতারণা!

ম.অ.ক.প.

## আনন্দ ঘোষ হাজরা

### নক্ষত্রেরা

নক্ষত্রেরা কোনোদিন অন্যায় করে না
জলাশয়ে দ্যাখা যায় তাহাদের মুখ ?
এতোদিন পরে তারা একতিলও ম্লান নয় ? মৃত নয় ?
প্রথম প্রজন্ম তারা দেখেছিলো ব'লে
অদ্যাবধি তেমনই সজীব

গাছ পড়ে গাছ পড়ে দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে
অগ্নিবৃত্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে ব'লে চৌপাহাড়ি বনের ভেতরে
সবুজ ঘাসেরা খুব আতঙ্কিত হয়
চলচ্ছক্তিহীনতায় এতোকাল কেটে গেছে তাহাদের দিন
এইবার পুড়বে আমূল তারা জানে ; রাত ভোরে—
বক্তৃতাসম্বল তুমি মাঝবনে দারুণ বিহ্বল
গণ আন্দোলন নেই
আগুন নেভানো যাবে এমন যথার্থ কোনো ব্যবস্থাই নেই
অথচ অনতিদূরে জল ছিলো দুর্গোৎসব হতো
এই জলে শৌচকাজও হতো—হোক্...
আগুন নেভানো তাও যেতো
অফুরন্ত খনির তিমিরে জল ছিলো।

অগ্নিবৃত্ত ক্রমশই ছোট হয় ছোট হয়ে আসে
গাছ পড়ে, শব্দ হয়, শাখাপ্রশাখায়
ব্যাপ্ত আগুনে পাতা পোড়ে
পুড়ে যায় ঘাস ;
'গণ আন্দোলন নেই ?'—এই ব'লে ভয়াবহভাবে
আগুনের মধ্যে থেকে উঠে আসে সর্বভুক
রক্তচক্ষু লেডি ল্যাজারাস।



জলাশয়ে দ্যাখা যায় নক্ষত্রের পরিণত মুখ
একতিলও ম্লান নয়, মৃত নয়
প্রথম প্রজন্ম থেকে সমান সজীব।

## শান্তনু দাস

### প্রতিবন্ধী বর্ষ : এক যুবতী

কিছু নয়, হয়তো বা কিছু
হাঁটু থেকে সাড় নেই, বাড় নেই
অথচ চেয়ারে যেন আলোর চেয়েও
সেই উজ্জ্বল রমণী
পিতৃপুরুষের দিকে যে চোখে তাকায়—
তা-ও ক্ষমা।
এত অহঙ্কারী তুমি ?
বল্গাহীন।
কাঁচুলি ছাড়াই যেন দুই বুকে সাঁওতালী মাদল
চিবুকে রজস্বলা, নারী বলতে যেটুকু বোঝায়
জারকের মতো।

তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারিনা
তুমি জানো—
প্রেম
জন্ম ঘৃণা
বৈরাগ্য বিষাদ
যেন সমস্ত প্রতিবন্ধ উরুর দুধারে ভেঙে
আকণ্ঠ প্রেমিকা হ'তে চাও

প্রকৃত পুরুষ আমি এই চোখে তাকাতে পারিনা।

## পঙ্কজ কুমার মণ্ডল

### সূর্যফুল ডুবে যায়

আকাশ চেকেছে মেঘে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখেছি
সার বেঁধে উড়ে যায় পাখী নির্দিষ্ট আশ্রয়ে
তাদের বুকের কালি মিলেছে মেঘের রঙে।
দক্ষিণে বা পুবে উড়িয়ে দিয়েছি দৃষ্টি।
খুবই অবাক, দূরের আকাশ মেঘহীন, লালাভ আবির হাসে
সেই পথের কোন পাখী একাই আকাশে এখন
তার পিঠের এ ধবলতা আগেতো দেখিনি।

এখানে বসে পৃথিবীকে দেখি, কিংবা প্রকৃতি বা মানুষ
অথচ আমার ঘরে ইটের দেয়াল, তাই অদৃশ্য আকাশ।
তবুতো বুকের জলে আকাশকে দেখি
যার বুকে সূর্যফুল ফুটে আছে নীরবেই।

তবু কে যেনো নিঠুর ভাবে কেড়ে নেয় আলো
ফলে আকাশও ক্রমাগত দূর হতে দূরে চলে যায়
কিংবা হে মেঘ, তুমিই ঝিরি ঝিরি পড়লে এবুকে
হারায় নদীর রঙ, সূর্যফুল ডুবে যায় হয়তো পাতালে।

---

বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
মৃণাল বসু চৌধুরীর
নতুন কাব্যগ্রন্থ
**ব্যক্তিগত ঋণ**
প্রকাশের অপেক্ষায়



## সলিল লাহিড়ী

### মনে আছে অতনুকে

অতনুকে মনে আছে ?
লালচুল টিয়াপাখী নাক ?
জীবনটা বড় বেশী এলোমেলো ছিল তার,
চোখে ছিল ঝড় সর্বনাশা।
সেই অতনুকে মনে আছে ?

দামোদর বালিচাকা চর ভেঙ্গে
ওপারের খেয়ালী বিকেলে,
মাঝে মাঝে হয়ে যেত উধাও হঠাৎ।
কিসের নেশায়, সবুজের ঝরোখায় ছুটে ছুটে যেত ?
আমাদের সেই অতনুকে মনে আছে ?

মাছরাঙ্গা পাখী দেখে ভুলে যেত
বউটা যে ঘর ভেঙ্গে পলাতকা।
ভুলে যেত জীবনের বঞ্চনার কথা।
লাল ঠোঁট, মাছরাঙ্গা পাখী, বুকে তার
টুকটুক ভালবাসা এঁকে রেখে যেত।
লালচুল, সেই অতনুকে মনে আছে ?

হিসেবের খাতা থেকে, জীবনটা টেনে এনে,
ছন্নছাড়া সময়ের হাত ধরে চলে চলে যেত,
বালিয়াড়ী ভেঙ্গে, আকাঙ্খিত প্রিয় থেকে দূরে।
কেন যেত সবকিছু ফেলে।
নিশি পাওয়া সেই অতনুকে মনে আছে ?

সবুজের শতাংশ যোজনে, আকাশ মাটির কানে

কিসের অন্বেষা ছিল। কোন স্বর এঁকে যেত
মাছরাঙ্গা পাখী তার লাল ঠোঁট দিয়ে,
সজল গভীর সেই নীল দীঘিজলে ?
কিসের গভীর কর্ষ নিশিডাক রেখে যেত সব অনুভবে ?
বারবার তাই ছুটে ছুটে যেত, অতনু কি,
হিসেবিক্ সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ?
মনে আছে আমাদের সেই অতনুকে ?

---

ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয়, খুব চুপিসারে
আনন্দ ঘোষহাজরার
নতুন কবিতার বই বেরিয়ে যাচ্ছে
বিশ্বজ্ঞান
৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৯এ খোঁজ করুন



## সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

### নীল পিঁপড়ের কামড়

রক্ত কিংবা ঘাম—সবই উড়ুনি
এখন একটার পর একটা পিঁপড়ে
ওপর ভেতর আর কামড়

সারা বিছানা ডেটলের ভয়
সারা উহুন মাছের চোখ
সমস্ত শার্ট খসা বোতাম
ছোট বড়ো নীল পিঁপড়ে
সারি দিয়ে সারি দিয়ে
এবং উড়ুনি দিয়ে বুক নাক চোখ
জড়িয়ে জড়িয়ে

এই ভালো
এখন প্লাবন নয়
ভেসে যাওয়া ইচ্ছাও নয়
কোনখানে ডাঙা
সেখানে কাদের সঙ্গে দেখা
না না

এই ভালো
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নীল শুঁড়
শরীরটা ফুলতে ফুলতে
সারা বাড়িটা ফেটে বেরিয়ে যাওয়া

ওটা একটা মৃতদেহ
ওই শব্দটা একটা কান্না

এখন একটা আগুন ছেড়ে বাইরে
একটা বৃষ্টি ছেড়ে আকাশে
একটা প্লাবন বুক ছেড়ে নদীতে

ওটা একটা লোক
ওটা একটা মৃতদেহ
ওটা বাইরের একটা লোক
ওটা মৃতদেহের একটা আড়াল
সব দেখছে
না না কাঁদছে
নিজেও জানেনা
অন্য কেউও জানেনা

## তুলসী মুখোপাধ্যায়

### সন্ধিক্ষণ

সন্ধির সহবাস দুই পুরুষ পাঞ্জায় ছুঁড়ে ফেলে
উদ্‌ভ্রান্ত তান্ত্রিকের মতো
যুদ্ধ যুদ্ধ বলে একেকদিন একছুটে বাইরে চলে আসি
সঙ্গে সঙ্গে
পত্নীর প্রগাঢ় চুম্বন এসে ঠোঁট চেপে ধরে
মায়াবী জালের মতো ছেঁকে ধরে সন্তানের হাসি
জলপ্রপাতের মতো মা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়
সন্ধির বাহুপাশ দুই হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
যুদ্ধ যুদ্ধ বলে একেকদিন একছুটে বাইরে চলে যাই
সঙ্গে সঙ্গে
ঘরের আরাম এসে হেসে হেসে কোমর দোলায়
নিদারুণ চোখ টিপে হাতছানি দিয়ে ডাকে রাজার শিরোপা
ভক্ত ভিখিরি এসে কড়া নাড়ে সদর দরজায়!



*With the Compliments of*

**TATA STEEL**

*With Best Compliments from*

**NISTARINI ELECTRIC CO. (P) LTD.**

Manufacturers of A. C. Electric Motor Grinder,
Polisher, Pumping Set etc.

*Sales & City Office :*
**20, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001**
**Phone : 22-6259 □ Gram : Trouble Free (Cal)**

*Regd Office & Factory :*
**75, G. T. Road, Baidyabati, Dt. Hooghly**
**Phone : 62-1871**